জয়নুলের পঞ্চাশের দশকের চিত্র : আধুনিকতা ও আত্মপরিচয়ের অন্বেষা

মাসুদা খাতুন জুঁই*

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার চর্চা শুরু হয়। একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনসূত্রে পশ্চিমাকরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূচনা ঘটে। অন্যদিকে এ অঞ্চলের আধুনিকতায় উপনিবেশবিরোধী ভাবনা ক্রিয়াশীল ছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলে আধুনিকতা শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ অঞ্চলে (তৎকালীন পূর্ববঙ্গ) পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মধ্য দিয়ে ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রভাব পড়ে শিল্পচর্চায়। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পচর্চার পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন অবিভক্ত ভারতবর্ষে কলকাতায় শিল্পশিক্ষা লাভের সময়েই একাডেমিক গণ্ডি অতিক্রম করেন। দেশ ভাগের পর বাংলাদেশে আগমনের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা তাঁর ব্যক্তিমানস, দেশপ্রেম, বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনা, বাঙালি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, পাশ্চাত্য চিত্রভাষা — এসবের সমন্বয়ে তিনি নিরীক্ষামূলক চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের আধুনিকতায় আত্মপরিচয় নির্মাণ করেন।

চিত্রচর্চা বা সামগ্রিক অর্থে শিল্পচর্চা সমাজবিচ্ছিন্ন কোনো কর্মকাণ্ড নয়। তাই কোনো দেশ বা সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতির দ্বারা শিল্পচর্চা স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিকায়ন শুরু হয়। সমাজের আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। প্রাচীন বা মধ্যযুগের শিল্প ধর্মকে আশ্রয় করে অথবা শাসক বা অভিজাত শ্রেণির তত্ত্বাবধানে নির্মিত হতো। কিন্তু আধুনিক সময়ে এসে শিল্প স্বতন্ত্র নির্মাণপ্রক্রিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পী ব্যক্তিক অথবা স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন এবং তাঁর কর্মের অনন্যতার চেতনা বিকশিত হয় (Peter, 1992: 57)। পশ্চিমা বিশ্বে আধুনিক শিল্পের ক্ষেত্রে ১৮৫০ থেকে ১৯৫০ — এ সময়কাল ছিল নজিরবিহীন নিরীক্ষার যুগ (Lawrence, 1996: 13)। এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। ব্রিটিশ শাসনের একপর্যায়ে ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রচর্চায় পাশ্চাত্য আধুনিকতার লক্ষণগুলো, যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নিরীক্ষাধর্মিতা প্রকাশ পেতে থাকে। এর সঙ্গে

* সহকারী অধ্যাপক, শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.7

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়, যা এ অঞ্চলের চিত্রচর্চার একান্ত নিজস্ব তা হলো, আত্মপরিচয় নির্মাণ। বৈশিষ্ট্যটি কেন এবং কীভাবে আমাদের আধুনিকতার অংশ হলো, সে ব্যাখ্যায় যেতে আমাদের ইউরোপের আধুনিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে হবে।

আধুনিকতার পাশাপাশি ইউরোপের অগ্রগতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো সাম্রাজ্যবাদ। ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তারের মাধ্যমে আধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়া ছিল আধুনিকতার সঙ্গে সমান্তরাল। ইউরোপের জাতিগুলো অ-ইউরোপীয় দেশগুলোতে উপনিবেশ স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেদের শাসন বিস্তার করে (Bill et al. ২০০৭: ১৩১)। এখন প্রশ্ন আসে, উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলোতে কীভাবে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনগুলো প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলো প্রকাশ পেয়েছে এভাবে:

> Paradoxically, anti colonialist movements often expressed themselves in the appropriation and subversion of forms borrowed from the institutions of the colonizer and turned back on them. Thus the struggle was often articulated in terms of a discourse of anti-colonial 'nationalism' in which the form of the modern European nation-state was taken over and employed as a sign of resistance (Bill et al. 2007: 12)।

এ কারণে উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলগুলোতে যে আধুনিকতা জন্মলাভ করেছে বা বিকশিত হয়েছে, তাকে গীতা কাপুর সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, '... as modernism evolves in conjunction with a national or, on the other hand, revolutionary culture, it becomes reflexive, (Geeta, 2001: 276)। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে ধার করে জাতীয়তাবাদের ছক নিয়ে এ অঞ্চলের আধুনিকতা তৈরি হয়েছে। ভারতীয় সমাজের বুদ্ধিজীবী অংশ অনন্য স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আধুনিক ধারণার আত্তীকরণের পরও তাদের একটা জাতীয় পরিচয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। আধুনিক ভারতের অগ্রপথিকদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সন্ধানে সম্মিলন ঘটে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উদীয়মান জাতীয়তাবাদের ধারণা (Geeta, 1982: 5)। উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে ও জাতীয় পরিচয় নির্মাণের এ সময়টিতে নতুন শিল্পীরা পশ্চিমা ভাবনা, রীতি ও কৌশলের দীক্ষা নিয়ে তার মাধ্যমে তাঁদের আধুনিক সত্তা গঠন করার পরও প্রণোদিত হলেন তাঁদের ঔপনিবেশিক অবস্থান এবং পশ্চিমা পরিচয় অতিক্রম করতে। তাই শিল্পীরা অতীতের থেকে বিযুক্ত হওয়ার (অর্থাৎ আধুনিক সত্তা গঠন করে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভাবনা ও ধ্যানধারণা থেকে আলাদা হওয়া) পাশাপাশি অতীত থেকে যথাযথ নির্বাচিত উপাদান (জাতীয়তাবাদ দ্বারা পুনরুদ্ধার, পরিশুদ্ধ ও পুনঃকল্পিত) গ্রহণ করলেন এ অঞ্চলের নতুন শৈল্পিক ভাষা নির্মাণে (Tapati, 1995: 8)। এভাবে আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা শিল্পে পরিস্ফুট হয়। এ কারণে এ অঞ্চলে ইউরোপ থেকে ভিন্ন, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আধুনিক শিল্প তথা চিত্রচর্চার যাত্রা শুরু হয়।

অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশের ক্ষেত্রে আত্মপরিচয় নির্মাণ যেমন এখানকার আধুনিকতাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলাচর্চার প্রারম্ভিক পর্যায়েও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নিরীক্ষাধর্মিতার পাশাপাশি এ আত্মপরিচয়ের অন্বেষা একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের লগ্নে নিজ ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মপরিচয় খোঁজার প্রক্রিয়া আধুনিক শিল্পের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। তবে যেহেতু বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলার অগ্রপথিকেরা অবিভক্ত ভারতে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন এবং শিল্পী হিসেবে আভির্ভূত হন, সে কারণে বলা যায়, কলকাতা ও শান্তিনিকেতনকেন্দ্রিক চিত্রচর্চার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে চিত্রচর্চা শুরু হয়। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প আন্দোলনের অগ্রপথিক জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) চিত্রকলায় এ আত্মপরিচয় নির্মাণের পর্বটি আলোচনার জন্য অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটটি আলোচনায় আনা প্রয়োজন। কারণ, ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতীয় আধুনিকতার মধ্যে শিল্পী হিসেবে জয়নুল আবেদিন কী স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আবির্ভূত হলেন এবং ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান পর্বে তিনি কীভাবে আমাদের আধুনিক চিত্রকলার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করলেন, তাঁর চিত্রচর্চার মধ্য দিয়ে তা অনুধাবনের জন্য ঔপনিবেশিক পর্বের চিত্রচর্চার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক।

ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে ভারত উপমহাদেশে চিত্রচর্চার সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটি হয় আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই স্কুলের মাধ্যমে ব্রিটিশ একাডেমিক রিয়ালিজম বা স্বভাববাদী চিত্ররীতি ব্যাপকতা লাভ করে ও প্রতিষ্ঠা পায়। তবে ইংরেজদের চাহিদামতো স্কুল তৈরি হলেও এ অঞ্চলের চিত্রচর্চা স্কুলের নিয়মে প্রবহমান থাকে না। চিত্রচর্চা সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভাবনা প্রক্রিয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা প্রভৃতিতে জারিত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ঔপনিবেশিক সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ, নগরায়ণ প্রভৃতি কারণে সমাজে যে চিন্তার পরিবর্তন ঘটে, তাকে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ নাম দেওয়া হয় এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মাঝে। সমাজচিন্তায় এই যে পরিবর্তন, তার স্বরূপ কেমন ছিল তার বিশ্লেষণ স্বল্পপরিসরে হলেও একটু প্রয়োজন। কারণ, এ পরিবর্তন চিত্রচর্চাকে প্রভাবিত করে। ইতিহাস-গবেষক সালাহ্উদ্দিন আহমদের মতে, ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ভাবধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, যা পশ্চিমের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা এবং অনুসন্ধিৎসু মানসিকতাকে উৎসাহিত করে। তিনি আরও বলেন, ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ যখন এ জ্ঞানচর্চার সংস্পর্শে আসে, তখন তা নানা প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং এ কারণে উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি হিন্দুর

সমাজচিন্তায় তিনটি স্বতন্ত্র ধারা গড়ে ওঠে। সেগুলো হলো, রক্ষণশীল, সংস্কারপন্থি ও আমূল সংস্কারবাদী। এদের মধ্যে সংস্কারপন্থিরা হিন্দুধর্মকে সমকালীন জ্ঞান ও সমালোচনার আলোকে পুনর্ব্যাখ্যা ও পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেন (সালাহ্উদ্দিন, ২০০০: ৩৮-৩৯)। এ ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মবাদ এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুবাদ উল্লেখযোগ্য দুটো বিষয় (জয়া, ২০১৪: ১৮০)।

বাঙালি হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ইংরেজদের বঞ্চনা ও বৈষম্যের প্রতিক্রিয়ায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয় এবং এ জাতি তৈরি করতে গিয়ে তারা হিন্দুত্বকে গ্রহণ করে (স্বপন, ২০১১: ৩৮৮-৩৮৯)। জাতীয়তাবাদ নির্মাণে হিন্দুত্ব ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদীদের লেখা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। যেমন ম্যাক্সমুলারের গবেষণাসূত্রে আর্যদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক জানার পর বাঙালি হিন্দুর স্বদেশচেতনার সঙ্গে আর্যগৌরব মিলেমিশে যায় (স্বপন, ২০১১: ৩৮৯)। জেমস মিল তাঁর *ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস* (১৮১৭) গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগ — এ তিন ভাগে ভাগ করেছেন (দ্বিজেন্দ্র, ২০০৮: ১৬-১৭)। তিনি দেখিয়েছেন ১২০০ সাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় রাজারা ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং তাঁর লেখায় ইন্দো-গ্রিক, শক, কুষান প্রভৃতি রাজবংশের ইতিহাস উপেক্ষিত হয়েছে (দ্বিজেন্দ্র, ২০০৮: ২১)। এ যুগ বিভাজনের মধ্য দিয়ে মিল 'সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চার ভিত্তি স্থাপন করেন' (দ্বিজেন্দ্র, ২০০৮: ১৬-১৭)। মিলের এ যুগবিভাজন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁরা 'ভারত সংস্কৃতির প্রকৃত সমন্বয়ী' চরিত্রটি উপেক্ষা করেন (দ্বিজেন্দ্র, ২০০৮: ২২)। এডওয়ার্ড সাঈদ প্রাচ্যতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন:

> ... মোটামুটি হিসেবে আঠারো শতকের শেষাংশকে প্রারম্ভকাল ধরে প্রাচ্যতত্ত্বকে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা যায় প্রাচ্য সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান, প্রাচ্যের মতামত অনুমোদন, প্রাচ্যকে বর্ণনা করা ও শিক্ষা প্রদান, প্রাচ্যকে শান্ত রাখা ও শাসন করার জন্য একীভূত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে; সংক্ষেপে প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য করা, প্রাচ্যকে পুনর্গঠিত করা এবং প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্বকরণের পশ্চিমা পদ্ধতিরূপে (এডওয়ার্ড, ২০০৫: ২৭)।

সাঈদের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রাচ্যতত্ত্ব সাম্রাজ্যবাদের বা ঔপনিবেশিক স্বার্থের সাথে জড়িত এবং এটা কোনো সরল ব্যাপার ছিল না। এখানে এ প্রসঙ্গগুলোর অবতারণা এ কারণে করা হলো যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আত্মপরিচয় নির্মাণের সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে এ হিন্দুত্ববাদ এবং প্রাচ্যতত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, আর্ট স্কুল থেকে পাস করা শ্যামাচরণ শ্রীমানীর বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পকলার ওপর লেখা বইয়ের বক্তব্য। *সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি* ও

আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী (১৮৭৪) নামে বইটিতে শিল্পশিক্ষার প্রতি শ্যামাচরণের অঙ্গীকার ছিল স্পষ্টত জাতীয়তাবাদী (Tapati, 1992: 123)। বইটিতে শ্যামাচরণ তাঁর অনুসন্ধিৎসা থেকে শিল্প সম্পর্কে যে ধারণা বিকশিত করেন, তা সে সময়কার অনুকরণের গতানুগতিকতা এবং একাডেমিক রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া (Tapati, 1992: 123)। শ্যামাচরণ প্রাচীন হিন্দু জাতির শিল্পকলাকে দেশ বা মাতার অলংকার হিসেবে বিবেচনা করে তৎকালীন শিক্ষিত শ্রেণিকে তার মর্ম উপলব্ধি করতে আহ্বান জানান (শ্যামাচরণ, ১৯৮৬: ৫৬)। শ্যামাচরণ তাঁর বইয়ে হিন্দু জাতি বলতে আর্য জাতিই বুঝিয়েছেন। তাঁর লেখায় জাতীয়তাবাদ ও প্রাচ্যতত্ত্ব মিলেমিশে গিয়েছে। শ্যামাচরণের দৃষ্টিভঙ্গি আর্ট স্কুলের স্বভাববাদী রীতিতে আঁকা ছবির বিষয়বস্তু নির্ধারণে প্রভাব ফেলে। একাডেমিক স্বভাববাদী রীতির সঙ্গে অতীত ভারতের ঐতিহ্যকে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টার উদাহরণ পাওয়া যায়।

বিশ শতকের শুরুতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭১-১৯৫১) ধোয়াপদ্ধতি স্বভাববাদী রীতি ত্যাগ করে নিরীক্ষামূলক চিত্রচর্চার উদ্বোধন ঘটায়, যা নব্যবঙ্গীয় ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। নব্যবঙ্গীয় ঘরানায় জাতীয়তাবাদী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ই বি হ্যাভেলের (১৮৬১-১৯৩৪) ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। হ্যাভেল শিল্পের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশের ওপর জোর দেন (Neelima, 2010: 28)। তাঁর এ আধ্যাত্মিকতার উৎস ছিল বেদান্ত দর্শন, যেখানে জগৎকে দেখা হয়েছে ভ্রম বা মায়া হিসেবে (Partha, 1992: 273)। অবনীন্দ্রনাথ নিরীক্ষাধর্মিতার মধ্য দিয়ে আধুনিকতার সূচনা করলেও তা প্রাচ্যবাদকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। স্বভাববাদী রীতির কিংবা নব্যবঙ্গীয় শিল্পীদের হিন্দু পৌরাণিক চরিত্র অঙ্কনের পেছনে আরও কিছু ব্যাখ্যা থেকে যায়। প্রাচ্যবাদী ইউরোপীয় লেখকদের একটি অংশ ভারতীয়দের 'অক্ষম, অপুরুষালি, অলস ও ধীর গতিসম্পন্ন' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে অভিহিত করলে বাঙালি অথবা হিন্দুদের দুর্বলতার বিপরীতে দাঁড় করানোর জন্য জাতীয়তাবাদীরা আগের যুগ থেকে বীরদের তুলে ধরেন, যেমন প্রাচীন পাণ্ডব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীর। সাহিত্যেও এর প্রকাশ দেখা যায়, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় (উমা, ২০১৭: ১৯-২১)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) স্বদেশি আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবাদের মধ্যে সংকীর্ণতাকে উপলব্ধি করেন এবং যা তাঁর কাছে মনে হয় 'বৃহত্তর মানবকল্যাণের বিরোধী' (স্বাতী, আশোক, ২০১৫: ৩৭)। স্বদেশি আন্দোলনের শেষের দিকে তিনি '...প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয় তত্ত্বের প্রচার শুরু করেন' (নেপাল, ১৪০২: ৮২)। ১৯০৮ সালে কলকাতায় এক ভাষণে (পূর্ব ও পশ্চিম) তিনি বলেন:

> ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে — ইহা অপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪: ৬৩-৬৪)।

তিনি আরও বলেন :

> ... আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪: ৬৭)।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ নতুন চেতনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে প্রয়োগের উদ্যোগ নেন। এ লক্ষ্যেই ১৯১৮ সালে বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১৯১৯ সালে বিশ্বভারতীর কলাভবনের যাত্রার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের শিল্পবিষয়ক নতুন ভাবনার বাস্তব কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে কলাভবনের যাত্রা শুরু করেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা তৈরি, এই ছিল কলাভবনের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

এ পটভূমিকে পেছনে রেখে জয়নুল আবেদিন ১৯৩২ সালে কলকাতা আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। জয়নুল আবেদিন যখন চিত্রকলার ভুবনে নিজেকে বিকশিত করছিলেন, তখন কলকাতায় চিত্রকলার দুটি উল্লেখযোগ্য ধারা ছিল – একাডেমিক ও ভারতীয় বা নব্যবঙ্গীয় রীতি (শোভন, ১৪০২: ৯২)। জয়নুল আবেদিন আর্ট স্কুলে একাডেমিক স্বাভাবিকতার রীতিতে ছবি আঁকা শুরু করেন। ময়মনসিংহের গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষ এবং সাঁওতাল পরগনার প্রকৃতি ও আদিবাসীদের পৌনঃপুনিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি আঞ্চলিক (local) বিষয়াবলিকে তুলে আনেন। তবে তিনি হঠাৎ করেই আঞ্চলিক বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া শুরু করেননি। তাঁর ছবিতে আঞ্চলিক বিষয় কেন প্রাধান্য পেল, তার কারণ জানতে কিছুটা পেছন ফিরে তাকাতে হবে।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ পদ থেকে ই বি হ্যাভেল পদত্যাগ করলে সেই পদে ১৯০৯ সালে পার্সি ব্রাউন (১৮৭১-১৯৫৫) যোগ দেন (Shri Jogesh, 1966: 35)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাধ্যক্ষ পদ থেকে ১৯১৪ সালে পদত্যাগ করলে সে পদে ১৯১৬ সালে পার্সি ব্রাউন একাডেমিক পদ্ধতির চিত্র অঙ্কনে দক্ষ যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৭৬-১৯৫৩) নিযুক্ত করেন এবং চারুকলা বিভাগকে দ্বিখণ্ডিত

করে চারুকলা (Fine Art) এবং ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা (Indian Style of Painting) নামে দুটি বিভাগ করেন। চারুকলা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় যামিনীপ্রকাশকে। এ প্রক্রিয়ায় একাডেমিক পদ্ধতির চিত্রচর্চা পুনঃপ্রবর্তিত হয় এবং এ বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে (Shri Jogesh, 1966: 39)। এভাবে কলকাতায় ১৯২০-এর দশকে স্বাভাবিকতার রীতি পুনরায় জেগে *ওঠে* অংশত পার্সি ব্রাউনের উৎসাহে এবং অংশত দুজন সহজাত গুণসম্পন্ন (gifted) এবং ভাবাদর্শের দিক হতে সক্রিয় (ideologically active) শিল্পীর উত্থানে। তাঁরা হলেন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯৮-১৯৪৮) এবং অতুল বসু (১৮৯৪-১৯৭৭)। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন বিমলাচরণ লাহা, যোগেশচন্দ্র শীল, সতীশ সিনহা, প্রহ্লাদ কর্মকার ও প্রমথনাথ মল্লিক (Partha, 2007: 125-127)। ১৯২০ সালে হেমেন্দ্রনাথের উৎসাহে এবং সুকুমার রায়ের সহযোগিতায় একাডেমিক গোষ্ঠী প্রাচ্য শিল্পীগোষ্ঠীর *রূপম* পত্রিকার আধিপত্য ব্যর্থ করার প্রচেষ্টায় *ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমি* নামে পত্রিকা বের করে। এ ছাড়া 'সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট'-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'সোসাইটি অব ফাইন আর্ট'-এর প্রতিষ্ঠা করে (Partha, 2007: 130)। তবে এ নতুন প্রজন্মের স্বভাববাদীরা ইতিহাসনির্ভর বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখাননি, তাঁরা ছবিতে আঞ্চলিক (local) বা স্থানীয় এবং দৈনন্দিন বিষয়াবলি অঙ্কনে আগ্রহী হন (Partha, 2007: 123-124)। এ প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় জয়নুলের আঞ্চলিক বিষয়ের উপস্থাপনা যুক্ত। তবে জয়নুলের গ্রামজনপদকে বিষয় হিসেবে নিয়ে করা চিত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। তিনি হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'পল্লীপ্রাণ'-এর মতো রোমান্টিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সিক্তবসনা গ্রামীণ বধূ ধরনের বিষয়ে আগ্রহী হননি, আবার তিনি যামিনীপ্রকাশের মতো তেলরঙে রোমান্টিক আবেগে ভরা প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেমন 'পদ্মা নদীতে সূর্যাস্ত'-এর মতো দৃশ্য চিত্রায়ণ করেননি। এ ছাড়া তিনি অতুল বসুর মতো প্রতিকৃতি চিত্রায়ণের মাধ্যমে খ্যাতি লাভ করবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যায়নি। তিনি স্বাভাবিকতার রীতিতেই কাজ করেছেন। কিন্তু বিষয়কে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেননি বা বিষয়ের অপরিবর্তিত অনুলিপি তৈরি করেননি। তিনি বিষয়ের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলো দৃশ্যপটে রং বা রেখায় ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে চিত্র সম্পাদন করেছেন। তাঁর চিত্রে রঙের প্রয়োগ ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive)। ইঙ্গিতপূর্ণ রঙের সঙ্গে দর্শকমন মিলে দৃশ্যটি সম্পূর্ণতা পায়। তাঁর রং ব্যবহারের সহজ, স্বচ্ছন্দ ভাব, সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস (composition) এবং বলিষ্ঠ ড্রয়িং ছবিকে প্রাণবন্ত করেছে। এ ছাড়া জয়নুলের চিত্রে বিষয় হিসেবে ময়মনসিংহ ও সাঁওতাল পরগনার গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষের যে পৌনঃপুনিক উপস্থাপন দেখা যায়, তা তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন। তাঁর এ ভাবনাকে শোভন সোম ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> জীবনকে যেমন তিনি (জয়নুল) পুঁথির পাতায় খোঁজেননি তেমনি রাজনৈতিক মতবাদের চশমা পরে দেখেননি... ঘরের পরিচয়, মাটির সংরাগ ছেড়ে তিনি ভৌগোলিক দূরত্বে অতীতের ধূসরতায় তাঁর আত্মাকে খোঁজেননি। তাঁর ছবিতে যা প্রকাশিত তা হলো আবহমান বাংলা। (শোভন, ১৪০২: ১১৮-১১৯)

এটা ঠিক যে, জয়নুল কোনো মতের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষয় নির্বাচন করেননি। চারপাশের বাস্তব জগৎ, যা তিনি সরাসরি অনুভব করেছেন তাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন তাঁর চিত্রকর্মে। কিন্তু এ বাস্তব জগতের রূপায়ণেও তিনি ভিন্নতা দেখিয়েছেন, সে সময়ে একাডেমিক চিত্রচর্চায় প্রচলিত রোমান্টিকতায় আপ্লুত বিষয়াবলি চিত্রায়ণ না করে। এ ধরনের চিত্রের বেশ চাহিদা ছিল ক্রেতাদের মধ্যে (শোভন, ১৪০২: ৯৩)। জয়নুলের মেধা ও দক্ষতা সহজেই তাঁকে হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার বা যামিনীপ্রকাশের মতো একটি শক্ত অবস্থান তৈরি করে দিতে পারত। কিন্তু তিনি এ প্রক্রিয়া থেকে দূরে থেকেছেন। এর কারণ হতে পারে তাঁর রুচি, পছন্দ এবং প্রকৃতি ও গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব বা দেশপ্রেম এবং তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর প্রভাব। এ কারণে অর্থ উপার্জনের সহজ পথকে তিনি উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন।

জয়নুল আবেদিনের শিক্ষকেরা কেউ শান্তিনিকেতন এবং কেউবা ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছেন বা ভ্রমণ করেছেন। এ ভ্রমণ ও শিক্ষা তাঁদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে। তাঁদের এ অভিজ্ঞতা ছাত্রদের আর্ট স্কুলের গণ্ডির বাইরে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জয়নুলের শিক্ষক মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত (১৮১৫-১৯৫৮) শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন (শোভন, ১৯৯৮: ২৬৩)। তাঁর আরেক শিক্ষক বসন্তকুমার গাঙ্গুলী (১৮৯৩-১৯৬৮) ফ্রান্সের একাডেমি জুলিয়ঁতে শিক্ষালাভ করেন, যেখানে সৃজনশীল চিত্রচর্চার ওপর জোর দেওয়া হতো (শোভন, ১৯৯৮: ২৬২-২৬৩)। কামরুল হাসান তাঁর এক লেখায় উল্লেখ করেন, ‘আবেদিন সাহেবের ব্যাপারে আমাদের যতটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে বলতে পারি যে তাঁর স্কেচ, কম্পোজিশন ও জলরঙের গুরু ছিলেন বসন্তকুমার গাঙ্গুলী’ (কামরুল, ২০১০: ৭১)। এ ছাড়া জয়নুল আবেদিনের সময়ে স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে (১৮৯৫-১৯২২) শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছিলেন। মুকুলচন্দ্র ১৯২৮ সালে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হিসেবে আর্ট স্কুলে নিয়োগ পান। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে জাপানে যান এবং সেখানকার চিত্রচর্চা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেরিকায় যান ও শিকাগোতে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন। তিনি লন্ডনের স্লেড স্কুল ও রয়েল স্কুল অব আর্টে শিল্পশিক্ষা লাভ করেন (শোভন, ১৯৯৮: ২৪৮-২৪৯)। ছাত্রদের নিজস্ব বিচারবোধ ও চিন্তা জাগ্রত করার লক্ষ্যে তিনি শিল্পকলা বিষয়ে বক্তৃতা, প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করতেন। তাঁরই উদ্যোগে ১৯২৯ সালে আর্ট স্কুলে যামিনী রায়ের লোকশিল্প নিয়ে নতুন রীতির প্রথম প্রদর্শনী এবং ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথের ছবির এ দেশে

প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় (শোভন, ১৯৯৮: ২৬৫-২৬৬)। ১৯১৫ সালে নন্দলাল বসু (১৮৮২-১৯৬৬), সুরেন কর (১৮৯২-১৯৭০) ও মুকুল দে-কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে গিয়েছিলেন নদীমাতৃক বাংলার রূপকে রঙে ও রেখায় প্রতিভাত করতে (স্বাতী, আশোক, ২০১৫: ১১৯)। জয়নুল আবেদিন ছাত্র থাকার সময় মুকুলচন্দ্র দে ও রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯০২-১৯৫৫) পদ্মা নদী ও বাংলার গ্রামজনপদকে নিয়ে আর্ট স্কুলে নিয়মিত এচিং করেন। জয়নুলের মধ্যে যে গ্রামের প্রতি দুর্বলতা ছিল, তা হয়তো আরও বেড়ে গিয়েছিল তাঁর শিক্ষকদের করা কাজ দেখে (শোভন, ১৪০২: ৯৪-৯৫)। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন আর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা তৈরি, এ ছিল কলাভবনের শিক্ষার উদ্দেশ্য। নন্দলালের একটি বড় অবদান ছিল রবীন্দ্রনাথের উপনিবেশবিরোধী পরিবেশবাদকে (Environmentalism) কলাভবনের চর্চার মধ্যে নিয়ে আসা। নন্দলাল নিজেও শান্তিনিকেতন-সংলগ্ন সাঁওতালপল্লির উৎসব, নাচ ও অন্যান্য কার্যক্রম প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে চিত্রে উপস্থাপন করেছেন। বিনোদবিহারী (১৯০৪-১৯৮০) সাঁওতাল জীবন নিয়ে ১৬টি ভিত্তি চিত্র করেছেন (Partha, 2007: 94)। আর রামকিঙ্কর (১৯০৬-১৯৮০) সাঁওতালদের বীরোচিত অবয়ব অমসৃণ, গতানুগতিকতার বাইরের উপাদান যেমন খোয়া, সিমেন্ট, কংক্রিট প্রভৃতি দিয়ে তৈরি করেন, যা সাঁওতাল জীবনের রূঢ়তার সঙ্গে এক হয়ে যায় (Partha, 2007: 96)। শান্তিনিকেতনের বিশ্বকে মিলিয়ে এ পরিবেশবাদ সেখানকার ছাত্রদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। জয়নুল আবেদিন এ প্রভাববলয় থেকে দূরে থাকতে পারেননি। তাঁর ছবিতে আবহমান বাংলাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো অবশ্যই ভূমিকা রেখেছে, নিজের গ্রামজনপদের উপস্থাপন সম্পর্কে তাঁকে আরও আস্থাবান করেছে। জয়নুলের গ্রামজনপদের পৌনঃপুনিক উপস্থাপন সম্পর্কে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন:

> ... তাঁর (জয়নুল) কাজ হচ্ছে... ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপরীত এবং ঔপনিবেশিক আধুনিকতার সংঘাত থেকে উত্থিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিরোধী, তাঁর কাজ বাঙালি গ্রামীণ কৃষক সমাজে সন্দেহাতীতভাবে প্রবেশ করার একটি মুহূর্ত। জাতীয়তাবাদী শৈল্পিক মুহূর্ত কৃষক সমাজের সঙ্গে শিল্পের বিযুক্ততা তৈরি করেছে, সেই সঙ্গে তৈরি করেছে বাস্তবিক জটিল এবং বিভিন্ন সম্পর্কের বদলে মতাদর্শের বিকল্প। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্টেলা ক্রমরিশ ঐ মতাদর্শের বিকল্পকে সমগ্র ইতিহাস করে তুলেছেন। তাঁদের জাতীয়তাবাদী শৈল্পিক মতাদর্শগত বিকল্প একপক্ষে ভারত শিল্পের ভাববাদী মুহূর্ত তৈরি করেছে, অন্যপক্ষে ভাববাদী মুহূর্তের মধ্যে সাম্প্রদায়িক টেনশন তৈরি করেছে। তার দরুন বিভিন্ন সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পরিস্থিতির মধ্যে সমাজ সমগ্রতার বোধে অংশগ্রহণ এবং মতাদর্শগত বিকল্পের মধ্যে বিযুক্ততার সূত্রপাত ঘটেছে। কাজে, শিল্প যে সামাজিক ভাষা এই বোধটি ছিন্ন হয়েছে। আবেদিনের

> কাজের মধ্যে দিয়ে সমাজ সমগ্রতার বোধ ফিরে এসেছে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যার বিপরীতে সৃষ্টিশীল এবং মুক্তির প্রাক্সিসের প্রবলতা নিয়ে।... বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বুদ্ধিবাদী বিকল্পের বদলে জনসাধারণের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করে রেখেছেন আমৃত্যু। এই যুক্ততাই তাঁর চেতনাকে সেক্যুলার করেছে একপক্ষে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ অন্যপক্ষে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিপরীতে। (বোরহানউদ্দিন, ১৯৯০: ৪৩)

অর্থাৎ জয়নুল আবেদিন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পর্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবনাপ্রসূত চিত্রকলাচর্চাকে অনুসরণ করেননি, যে জাতীয়তাবাদী ভাবনায় আত্মপরিচয় নির্মাণের সাংস্কৃতিক প্রকাশের মধ্যে ভাববাদ বা অধ্যাত্মবাদের আড়ালে ধর্মীয় পরিচয় এবং প্রাচ্যতত্ত্বকে খুঁজে পাওয়া যায়। এ জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে অস্বীকারের দরুন এখন প্রশ্ন আসতে পারে, তাঁর মধ্যে স্বাজাত্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল কি না, সেটা অবশ্যই ছিল, যার দরুন তিনি গ্রামবাংলাকে শেষ পর্যন্ত ছবির বিষয় করেছেন। তাঁর দেশাত্মবোধের উৎস তাঁর গ্রামীণ সমাজের সমগ্রতার মধ্যে। এ সমগ্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর ছবি আঞ্চলিক বিষয়াবলিকেই প্রাধান্য দেয় এবং তা হয় ধর্মনিরপেক্ষ। তাই তাঁর কাজ সহজেই আলাদা করা যায় ঔপনিবেশিক পর্বে জাতীয়তাবাদী শিল্পীদের আত্মপরিচয়ের অন্বেষা থেকে।

জয়নুল আবেদিনের ছবির ভাষায় একটি বড় পরিবর্তন আসে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে আঁকা ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা তৈরি এ দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে কলকাতা শহরে ভিড় জমায়। এসব ক্ষুধার্ত মৃত্যুপথযাত্রী, কঙ্কালসার মানুষগুলোকে চিত্রায়ণের মধ্য দিয়ে জয়নুল ঔপনিবেশিক শোষণের ভয়াল রূপকে সার্থকভাবে চিত্রপটে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। অস্থিসর্বস্ব মানুষগুলোকে আঁকার ক্ষেত্রে জয়নুলের তুলির রেখা হয়ে ওঠে কর্কশ, কঠিন। মানুষের করুণ অবস্থা তুলে ধরার জন্য পটভূমি ফাঁকা রেখে, চিত্রপটের পুরো অংশ জুড়ে মানুষই আঁকলেন। অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে আঁকা জয়নুলের রেখানির্ভর এ ছবিগুলো দক্ষতা ও নান্দনিক গুণের জন্য অন্য শিল্পীদের দুর্ভিক্ষ নিয়ে আঁকা চিত্রকে ছাপিয়ে আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। সমসাময়িক শিল্পসমালোচক ও সি গাঙ্গুলী ১৯৪৪ সালে জয়নুলের দুর্ভিক্ষের ছবি সম্পর্কে লেখেন:

> তাঁর এসব নির্মম তুলির টানের দুঃসাহসিকতার মধ্যে একাধারে ছিল স্বতঃস্ফূর্ততা ও সততা এবং তার সাথে আবার যুক্ত হয়েছিল আপসহীন বাস্তবতা, যা কিনা বাংলার আধুনিক শিল্পীদের কাজে একেবারেই বিরল এক বৈশিষ্ট্য। (উদ্ধৃত, নজরুল ২০০২: ১৩)

সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর এ প্রকাশকে সম্ভব করে তুলেছিল। দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা জয়নুলকে অধিক সমাজসচেতন করে তোলে। এর প্রমাণ শুধু

তাঁর আঁকা ছবি নয়, ১৯৪৩-৪৫ সালের মধ্যে বামপন্থি সাহিত্যিক, শিল্পী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সংযোগও এটা প্রমাণ করে। ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভা-সমাবেশ এবং গণনাট্য সংঘের প্রতিটি সভা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি ও কামরুল হাসান আমন্ত্রিত হন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫: ৩৫)। যদিও তিনি বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতাবোধের আধিক্য ছিল বলেই তিনি এ সময়ে সাধারণ জনগণের পক্ষে বামপন্থিদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে এড়িয়ে যেতে পারেননি।

জয়নুলের পরবর্তীকালের আঁকা অনেক ছবিতে দুর্ভিক্ষের ছবির গুণাগুণ উপস্থিত। পরিমিতিবোধ, গতিময় ও ক্ষিপ্র তুলির টান, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জমিন উভয়ের গুরুত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে অনেক ছবিতে বিদ্যমান। ১৯৪০-এর শেষ দিকে তাঁর কয়েকটি ছবিতে যেমন ‘মাছধরা’ (জলরং, ১৯৪৬), ‘ফসলতোলা’ (জলরং, ১৯৪৮), ‘পলাশবনে সাঁওতাল নারী’ (তেলরং, ১৯৪৮) প্রভৃতিতে মানুষের অবয়ব অনেক বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা জয়নুলকে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের অনেক কাছে নিয়ে আসে, মানুষকে কাছ থেকে দেখতে অনুপ্রাণিত করে।

দেশ বিভাগের পর জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ১৯৪৮ সালে ঢাকায় ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট’ নামে শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। কলকাতা আর্ট স্কুলের বাঙালি মুসলমান শিল্পী ও শিক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের সহযোগিতায় তিনি এ তাৎপর্যপূর্ণ কাজটি করেন। তাৎপর্যপূর্ণ এ অর্থে, যেখানে এ অঞ্চলে অবকাঠামোগত উল্লেখযোগ্য উন্নতি ছিল না, সেখানে আধুনিক শিল্পের মতো সংস্কৃতিচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সাধারণ মানুষের ভাবনার ঊর্ধ্বে। আধুনিক শিল্প নির্মাণের মতো জটিল বিষয়কে সে সময়ের রক্ষণশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে জয়নুল সমাজ অগ্রগতির সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘... ছবি আঁকার সাফল্যের চেয়ে আমি তৃপ্তি পাই আরও অনেকে ছবি আঁকতে পারবে এমন একটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার প্রচেষ্টায়’ (নজরুল, ২০০২: ৩১)। এ লক্ষ্য ছিল বলেই জয়নুল আবেদিন কলকাতায় জীবিকার নিশ্চয়তা এবং প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি ছেড়ে সামান্য স্কুলের চাকরি নিয়ে স্বল্প পরিচিত ঢাকায় চলে আসতে পেরেছেন। ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে কলকাতা আর্ট স্কুলের পাঠ্যসূচি অনুসরণ করা হলেও জয়নুল আবেদিন এখানকার ছাত্রদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ওপর গুরুত্ব দেন। এ লক্ষ্যে তিনি ছাত্রদের বাংলার প্রকৃতি ও জনজীবনকে গভীরভাবে অনুধাবন ও পর্যবেক্ষণের জন্য ক্লাসরুমের বাইরে গিয়ে অনুশীলনের ওপর জোর দেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫: ৬৫)। এ প্রসঙ্গে আমিনুল ইসলাম স্মৃতিচারণায় লিখেছেন:

> এ-সময় আবেদিন সাহেব একটা কম্পোজিশন ক্লাস নিয়েছিলেন, যার সাবজেক্ট ছিল স্বর্ণকার, ধুনকার, নৌকায় গুন টানা, কামার অথবা কুমারের কর্মরত অবস্থা।...শিল্পী হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এই সব দরিদ্র শ্রমজীবী-জীবনের ছবি আঁকার প্রবর্তনা, ঢাকা আর্টস্কুলের পরবর্তী প্রায় সমস্ত ছাত্রেরই সামাজিক ভাবনায় প্রভাব ফেলেছে বহুদিন। (আমিনুল, ২০০৩: ৩৫)

আর্ট ইনস্টিটিউটের সূচনা এবং এর ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ মানুষের জীবনকে বোঝার তাগিদ নিশ্চিতভাবে আমাদের আধুনিক চিত্রকলা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছে। জয়নুলের প্রচেষ্টায় আমাদের আধুনিক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে সমাজের শুধু সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর একতরফা অধিকারের মধ্য দিয়ে নয়, বরং সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে; তা শিল্পভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রেই হোক বা শিল্পচর্চায় অধিকারের প্রশ্নে হোক।

'৫০-এর দশকে জয়নুলের কিছু চিত্র এ বিষয়টিকে যেন আরও স্পষ্ট করেছে। তাঁর এসব চিত্রে বিষয় হিসেবে বাংলার গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতি '৫০-এর দশকে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। '৫০-এর দশকের শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবনা বিকাশ লাভ করে। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিকশিত বাঙালি জাতীয়তাবাদ ছিল অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ। ১৯৪৮-'৫২ সময়ে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ধারায় পূর্ব বাংলায় বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান ও চর্চা শুরু হয় ইতিহাস লেখায়, গবেষণায়, সাহিত্যচর্চায় এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে (হাসান, ১৯৯২: ৩০)। পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি তার আবহমান ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান শুরু করে। জয়নুল আবেদিনের '৫০-এর দশকের ছবিগুলোতে আবহমান বাংলার গ্রামীণ মানুষের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা লক্ষণীয়। জয়নুল আবেদিনের নিজ ঐতিহ্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ছবির মধ্য দিয়ে বাঙালির অস্তিত্বচেতনাকে প্রবাহিত করার কারণ হিসেবে যে ঘটনাটি প্রথমে উল্লেখ করতে হয়, তা হলো তাঁর বিদেশভ্রমণ। ১৯৫১ সালে সরকারি বৃত্তির অধীনে তিনি স্লেড স্কুল অব ফাইন আর্টে ছাপচিত্র ও পেইন্টিংয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ব্রিটেনে যান। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আর্ট সেন্টারে পটারি ও টেক্সটাইল ডিজাইনিংয়ের ওপর প্রশিক্ষণ নেন এবং শিল্পসংক্রান্ত নানা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি ও তুরস্কের বিভিন্ন মিউজিয়াম ও অনেক শিল্প প্রদর্শনী দেখেন এবং এসব দেশের অনেক বিখ্যাত শিল্পীর সঙ্গে শিল্প সম্পর্কে মতবিনিময় করেন (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫: ৭৪)। এ বিদেশভ্রমণ ও উচ্চশিক্ষা তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত ও ঐতিহ্যচেতনাকে বৃদ্ধি করে। তিনি '... আমাদের শিল্পের গতিমুখ লোক-ঐতিহ্যের দিকে ফেরানোর এবং এই সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সঙ্গে

আধুনিক শিল্পের সমন্বয় সাধনের কথা' (সৈয়দ আজিজুল, ২০১৫: ৯৫) বলেন। কামরুল হাসানের লেখা থেকে এ বিষয়ে জানা যায়। কামরুল হাসান লিখেছেন:

> শিল্পী জয়নুল আবেদিন যখন বিদেশ থেকে ফিরে বাংলার পটুয়া শিল্পীদের চিত্রকলার বিদেশে কী মর্যাদা এবং এটাই আমাদের চিত্রকলার আসল পরিচয় বলে আখ্যায়িত করলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার ব্রতচারী-শিবিরে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে আবার নতুন করে আঁকড়ে ধরেছি। এই সময়, অর্থাৎ ১৯৫২ সালের শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৩ সালের বেশ কিছুদিন একটি সংমিশ্রিত পদ্ধতিতে অনেক ছবির খসড়া এঁকেছিলেন শিল্পী আবেদিন (কামরুল, ২০১০: ৩৬)।

এ ছাড়া কামরুল হাসান উল্লেখ করেন যে জয়নুল আবেদিন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে 'বাংলাদেশের মূল লোকশিল্পের প্রায় প্রতিনিধত্বমূলক সব নিদর্শনই' দেখেছেন এবং এ দেখার মধ্য দিয়ে জয়নুল নিজের দেশকে বুঝেছেন (কামরুল, ২০১০: ১০০)। কামরুল হাসানের এ বক্তব্যগুলো থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, ঐতিহ্যের তাৎপর্যের গভীরতা জয়নুল বিদেশে গিয়ে বেশি উপলব্ধি করেন। ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে জয়নুলের উদ্যোগে আর্ট ইনস্টিটিউটে এ দেশের প্রথম লোকশিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় (শাওন, ২০০৯: ২২)। বাংলাদেশের লোকশিল্পের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই ছিল এ প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

'৫০-এর দশকে জয়নুল আবেদিনের আঁকা 'মা ও শিশু' (টেম্পেরা, ১৯৫১), 'কলসী কাঁখে নারী' (জলরং, ১৯৫১), 'গুনটানা' (গোয়াশ, ১৯৫৩), 'দুই বোন' (গোয়াশ, ১৯৫৩), 'নারীমুখ' (বোর্ডে গোয়াশ, '৫০-এর দশক), 'পাইন্যার মা' (গোয়াশ, ১৯৫৩), 'বাঙালী রমণী' (কাগজে রঙিন কালি, ১৯৫৩), 'কৃষক' (জলরং ১৯৫৩), 'মহিলার মুখ' (কাগজে গোয়াশ, ১৯৫৩), 'মা ও শিশু' (রঙিন কালি, ১৯৫৩), 'চিন্তা' (টেম্পেরা, ১৯৫৩), 'মা ও শিশু' (১৯৫৩) প্রভৃতি ছবি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রূপ বা গড়নের সরলীকরণ, সমতলীয় রঙের প্রয়োগ, বহিঃরেখার ব্যবহার, অলংকারধর্মিতা, মাটির পুতুলের মতো দেহের গড়ন প্রভৃতি লোকশিল্পের রীতি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির (যেমন কিউবিস্ট বা এক্সপ্রেশনিস্ট) সংশ্লেষ ঘটেছে। এভাবে জয়নুল ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন আঙ্গিকের ছবি করেন, যা আত্মপরিচয় নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পের ভাষায় পরিণত হয়। তবে জয়নুলের ছবিতে আত্মপরিচয় নির্মাণের আরও কিছু ব্যাখ্যা থেকে যায়।

ভাষা আন্দোলন ছাড়াও পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশ লাভ করে (হারুন, ২০০৩: ৪৬)। পাকিস্তান রাষ্ট্র বৈষম্য সৃষ্টি করেছে মূলত আঞ্চলিক পরিচয়ের সূত্র ধরে, বাঙালি-অবাঙালির ভিত্তিতে (সিরাজুল, ২০০৭: ২১১)। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের

পর থেকে পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে, বিশেষ করে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের জীবনে শোষণের মাধ্যমে দুর্দশা নেমে আসে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এসব নির্যাতন ও শোষণের কারণে '... পুঞ্জীভূত প্রক্রিয়া জনগণের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে' (বদরুদ্দীন, ২০০৭: ৩৫৩)। যেমন, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফায় সাধারণ জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ '... পূর্ববঙ্গের জনগণ বাঙালি হিসাবে আপন অস্তিত্বের প্রবল স্বাক্ষর উপস্থিত করে' (মুহম্মদ আবদুর ও অন্যান্য ২০১৩: ৪৫৭-৪৫৮)। 'মুসলিম লীগ ছিল মূলত পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক এবং শিল্পপতি, ভূস্বামী, ব্যবসায়ী ও মুষ্টিমেয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই ছিল এর সমর্থক। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে ছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক এবং বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি।' (কামাল, ২০০৭: ৩৭৩) কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে গ্রামীণ মানুষেরা ছিল অপরিহার্য উপাদান। ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষকের মতে, 'জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করেছে, অধস্তন গ্রুপসমূহের আন্দোলন তৈরির সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে...' (বোরহানউদ্দিন, ২০০৫: ২৮)। গ্রামীণ মানুষ একদিকে ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির ধারক, অন্যদিকে জাতীয় পরিচয় নির্মাণে এদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কাজেই বাঙালি আত্মপরিচয়ের আর এক প্রকাশ সাধারণ গ্রামীণ মানুষ। জয়নুলের মধ্যে এ বোধটি ক্রিয়াশীল ছিল '৫০-এর দশকে গ্রামীণ মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে চিত্রপট জুড়ে আঁকার মধ্য দিয়ে। যেমন 'নারীমুখ', 'মা ও শিশু' (টেম্পেরা, ১৯৫১), 'কলসী কাঁখে নারী', 'দুই বোন', 'পরিবার' (জলরং, ১৯৫৩), 'কৃষক', 'বাঙালী রমণী', 'চিন্তা', 'বিশ্রামরত তিন রমণী' (টেম্পেরা, ১৯৫৩), 'পাইন্যার মা', 'চার মুখ' (তেলরং, ১৯৫৩), 'মা ও শিশু' (১৯৫৩), 'আয়নাসহ বধূ' (তেল রং, ১৯৫৩) প্রভৃতি। আরও কিছু বৈশিষ্ট্য এ ছবিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে, যার মধ্য দিয়ে বাঙালির আত্মপরিচয় নির্মাণপ্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। জয়নুল এ ছবিগুলোতে মানুষকে eye level বা চোখের উচ্চতা বরাবর দৃষ্টিকোণ নিয়ে দেখেছেন। এ ছাড়া ছবিতে মানুষগুলো front angle বা সম্মুখভঙ্গির অধিকারী বা সামনের দিকে মুখ করে বসা বা দাঁড়ানো। এ দুটো অবস্থানের ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে John Sular-এর 'Photographic Psychology: Image and Psyche' থেকে কিছু বক্তব্যের উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। তিনি eye level-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

> For a level camera angle with humans and animals, we're shooting at the eye level of the subject. With people, it's the natural way to view the person. It shows people the way we would expect to see them in real life. Psychologically, we're seeing eye-to-eye with the person, we feel equal status and power with them. (2013)

Front angle নিয়ে Sular-এর ব্যাখ্যা হলো:

> ... when you shoot from the front of a subject, you're assuming a straight-on, matter-of-fact, no-nonsense aproach. It might even seem like an honest, non-deceptive point of view. If the subject is looking into the camera, you and the subject are head-on and face-to-face. You're aware of the subject and the subjet is aware of you... When subject is not looking into the camera, the front angle might still convey that no-nonsense feeling that "I'm right here before you, looking at you." The photograper and viewer of the photo are making their presence known. (2013)

জয়নুলের এ ছবিগুলো আই লেভেল থেকে আঁকা হয়েছে। বসে-থাকা মানুষগুলোও আই লেভেল থেকে বা চোখ বরাবর উচ্চতা থেকে আঁকা, মনে হয় শিল্পী যেন নিজেও সামনাসামনি বসে মানুষটিকে দেখছেন। এ কারণে দর্শক বা শিল্পী ছবির মানুষগুলোর সাথে নিজেকে একই অবস্থানে দেখে। বাঙালি ঐতিহ্যের ধারক এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অংশ এ গ্রামীণ মানুষগুলোকে শিল্পী তাঁর এবং দর্শকের মানসচেতনার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সম্মুখ অবস্থানে থাকার কারণে ফিগারগুলো নিজের অবস্থান সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন। বাঙালি হিসেবে অস্তিত্বচেতনা ছবিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। দৃঢ়তাসূচক ভঙ্গিকে ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরোধের ভাষা হিসেবে ধরা যেতে পারে। এভাবে ছবিগুলো জাতীয়তাবাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রতীক হয়েছে। তবে উল্লিখিত অধিকাংশ চিত্রে নারী অবয়বের প্রাধান্য থাকার কারণে আরেকটু ব্যাখ্যা থেকে যায়। নারী অবয়বের উপস্থাপনার ধরন কেমন ছিল? এর উত্তরে শিল্পসমালোচক ও গবেষক নিসার হোসেনের লেখা থেকে বক্তব্য উদ্ধার করা যায়:

> ... ছবিগুলিতে নারীদেহকে লৌকিক মূল্যবোধ-জাত উর্বরা শক্তির প্রতীক হিসেবে যেমন তুলে ধরা হয়নি, তেমনি নারীদেহের ভঙ্গি ও মাধুর্যকে গুরুত্ব দেয়া সত্ত্বেও তাতে শরীরী-কামনার উত্তাপ প্রশ্রয় পায়নি। বরং আবেদিনের অন্যান্য ছবির মত এখানেও নারীরা গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি... এদের সরল চেহারায় সম্ভ্রম রক্ষার সহজাত প্রবণতা আর গৃহিণীর সুখ-স্বপ্নের আভাস যেমন লক্ষ করা যায়, তেমনি এদের পরিশ্রমী কর্মক্ষম ভাবটিও যেন অটুট রয়েছে (নিসার, ২০০৭: ২৮০-২৮১)।

গ্রামীণ মানুষকে তৎকালীন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পটভূমিতে প্রাসঙ্গিক করার ক্ষেত্রে আরও কিছু ছবি বিশ্লেষণের দাবি রাখে। 'বিদ্রোহী গরু' (জলরং, ১৯৫১), 'মই দেয়া' (জলরং, ১৯৫১), 'কালবৈশাখী' (জলরং ১৯৫১), 'গুনটানা', 'সংগ্রাম' (টেম্পেরা, ১৯৫৪) প্রভৃতি ছবিগুলোতে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অভিযান বা বাধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতীকী ব্যঞ্জনা এ ছবিগুলোতে হয়তো প্রকাশ পেয়েছে।

'৫০-এর দশকে জয়নুলের ছবিগুলো আত্মপরিচয় নির্মাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং নতুনত্বের সূচনা করে। এ স্বাতন্ত্র্য বিচার করা যেতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানের চিত্রচর্চার সাথে তুলনা করে। জয়নুল আবেদিন, সফিউদ্দীন আহমেদ (১৯২২-২০১২) প্রমুখ শিল্পীর সমসাময়িক পশ্চিম পাকিস্তানের শাকির আলী (১৯১৬-১৯৭৫), জুবেইদা আগা (১৯২২-১৯৯৭), শেখ সফদর (১৯২৪-১৯৮৩), অজ্জির জুবি (১৯২২) প্রমুখ শিল্পী ১৯৪৭ সালের দিকে বিমূর্ত রীতির চর্চা শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী রীতির (আবদুর রহমান চুঘতাই, ফাইজী রাহামিন, আল্লাহ বক্স প্রমুখের চিত্র) বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান। জুবেইদা আগা ছিলেন অগ্রপথিক। তাঁর কাজে বিমূর্ত রীতির শুরু ১৯৪৬-এর দিকে (Jalal, 1962: 102-103)। তাঁদের বিমূর্ত রীতির বিপরীতে জয়নুলের ছবি বাস্তবধর্মী গুণ অর্জন করেছে। এ বাস্তবধর্মিতা বাস্তব জগতের হুবহু নকল নয়। এ বাস্তবধর্মিতার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় এভাবে:

> Reality is here seen not as static *appearance* but as the movement of psychological or social or physical forces; realism is then a concious commitment to understanding and describing these. It then may or may not include realistic description or *representation* of particular features. (Raymond, 1988: 261)

জয়নুলের অনেক ছবিও আঙ্গিকের নিরীক্ষাধর্মিতার (যেমন, লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য রীতির সংশ্লেষ) কারণে বাস্তবের সরাসরি উপস্থাপন হয়নি; কিন্তু তাঁর ছবি সামগ্রিকভাবে সেই সময়ে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছিল। এ কারণে তাঁর ছবিতে বাস্তবতার বোধ প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পক্ষে আত্মপরিচয় নির্মাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে স্বতন্ত্র ভাষা নির্মাণের মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জয়নুল বলেন:

> বাঙালির ভাষা, বাঙালির সংস্কৃতির জন্য সবার যে আন্দোলন, সম্ভবত তারই প্রভাব পড়লো অবচেতনভাবে আমারও মনে, বাঙালির লোকজ শিল্পরীতিকে তুলে ধরতে হবে, পাশ্চাত্য প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করার একটা বিদ্রোহ হিসাবেই রচিত হলো আমার একটি চিত্রপর্যায় এবং সম্ভবত নিজেরই অজ্ঞাতে এইসব শক্তি কাজ করেছে (নজরুল, ২০০২: ২৯-৩০)।

জয়নুল আবেদিনের শিল্পদর্শন ও শিল্পভাষা '৫০ ও '৬০-এর দশকের অনেক শিল্পীর চেতন-অবচেতনে প্রভাব রেখেছে। মুর্তজা বশীর তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন:

> ... ৫২ সালে প্রথমবারের মতো বিদেশ ঘুরে ফিরে আসার পর তাঁর (জয়নুল) চিত্রে দেখি পাশ্চাত্য ও এদেশের লোকজ রীতির সমন্বয় ঘটাবার এক প্রয়াস, যা তখন আমাদের সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এমনকি সেই সময়কার আঁকা তাঁর 'কলসী কাঁখে রমণী' বা 'মা ও ছেলে' কিংবা 'বেদেনি' অথবা 'প্রসাধনী' ইত্যাদি ছবি দেখে আমিও ১৯৫৪ সালে পাস করার পর অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করতে থাকি। (মুর্তজা, ২০১৪: ১৪৫)

রশিদ চৌধুরীর শিল্পীমানস গঠনে জয়নুলের '...আত্মপরিচয় আবিষ্কারে লোকজ জীবন ও সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত' হওয়ার বিষয়টি বড় ভূমিকা পালন করেছে (নাসিমা, ২০০৭: ৩৬১)। আবার কাইয়ুম চৌধুরীর ক্ষেত্রে বলা যায় 'লোক-ঐতিহ্যের প্রতি জয়নুল আবেদিনের সুতীব্র অনুরাগ কাইয়ুম চৌধুরীর মনেও ওই—শিল্প প্রকরণের প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণ সৃষ্টি করে' (সৈয়দ আজিজুল, ২০০৭: ৩৮২)। আমিনুল ইসলামের ১৯৫৮ সালে করা 'দুর্গত' নামে একটি ছবিতে মানুষকে উপস্থাপনের ভঙ্গি (আই লেভেল ও সম্মুখভঙ্গি) অবচেতনেই জয়নুল আবেদিনের ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। এভাবে জয়নুলের নির্মিত নন্দনচেতনা পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের শিল্পভাষা নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।

পরিশেষে বলা যায়, জয়নুল আবেদিনের মানসচেতনা ও শিল্পচেতনা আমাদের আধুনিক চিত্রকলার প্রারম্ভিক পর্যায়কে বিশিষ্ট করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর চিন্তাতেও মানবসমাজের সমগ্রতার বা মানবকল্যাণের উপস্থিতি ছিল। যদিও তিনি কোনো নির্দিষ্ট শিল্পরীতির মতবাদ নিয়ে অগ্রসর হননি, তবে তাঁর চিন্তায় শিল্পকে জীবনঘনিষ্ঠ করার বাসনা ছিল। সুন্দর জীবন, উন্নত রুচি–এসব তাঁর শিল্পচিন্তার সঙ্গে জড়িত ছিল। দেশ ও সমাজকে নিয়ে ভাবনা তাঁর শিল্পচর্চার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল। তিনি অবাঙালি শাসকদের মাঝে, তাদেরই সাহায্যে বাঙালিয়ানা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ করে গেছেন এবং তাতে সফল হয়েছেন। ঐতিহ্যবাহী বাঙালি সংস্কৃতির ধারক সাধারণ গ্রামীণ মানুষই তাঁর চিন্তায় ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি সার্বিক অর্থে প্রগতিশীল ছিলেন। এ প্রগতিশীলের সংজ্ঞা হলো 'যে ব্যক্তি তার গোষ্ঠী বা শ্রেণির সংকীর্ণ স্বার্থগণ্ডি অতিক্রম করেন, উন্মুক্ত করেন, অতিক্রম করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন, আন্দোলন সংগঠিত করেন তিনিই ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিশীল' (দুলালকৃষ্ণ, ২০০৮: ৪০)। মানবতাবোধ আর দেশাত্মবোধ জয়নুলকে তাঁর শ্রেণিস্বার্থ অতিক্রম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, নিজেকে মানবসমাজের অংশ হিসেবে সমগ্র মানবসমাজের জন্য কাজ করতে প্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর চিত্রে সাধারণ মানুষের উপস্থিতির প্রাধান্যও এটা প্রমাণ করে। বস্তুত মানবসমাজের বাস্তবতাবোধ দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। তাঁর চিত্রকর্ম ও সমাজকর্ম— দুটোই এর প্রমাণ। '৩০ ও '৪০-এর দশকে ময়মনসিংহ আর সাঁওতাল পরগনার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বিষয়াবলির উদ্বোধন, '৪০-এর দশকে দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে সমাজবাস্তবতার সাথে পরিচিত হওয়া, সাধারণ মানুষের কাছে আসা, আর এসব অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে '৫০-এর দশকে চিত্রচর্চার মাধ্যমে পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার আত্মপরিচয় নির্মাণ — এসব তাঁর সমাজচেতনারই অংশ। এভাবেই তিনি আমাদের আধুনিকতাকে নির্মাণ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আমিনুল ইসলাম, ২০০৩। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব ১৯৪৭-১৯৫৬*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

উমা চক্রবর্তী, ২০১৭। *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ব্রাত্যজনের চোখে* (অনুবাদঃ অম্লান ভট্টাচার্য), সেতু প্রকাশনী, কলকাতা।

এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ, ২০০৫। *অরিয়েন্টালিজম* (ভূমিকা ও ভাষান্তরঃ ফয়েজ আলম), সংবেদ, ঢাকা।

কামরুল হাসান, ২০১০। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা* (সংগ্রহ ও সম্পাদনাঃ সৈয়দ আজিজুল হক) প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

কামাল উদ্দিন আহমেদ, ২০০৭। 'স্বায়ত্তশাসনের সন্ধানে', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস,* (সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদকঃ সাজাহান মিয়া) বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

জয়া চ্যাটার্জি, ২০১৪। *বাঙ্গলা ভাগ হল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ ১৯৩২-১৯৪৭*, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাস, ২০০৮। *বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের স্বরূপ*, নক্ষত্র প্রকাশন, কলকাতা।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা, ২০০৮। *আদি ভারত, একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (অনুবাদঃ গৌরীশংকর দে), প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

নেপাল মজুমদার, ১৪০২। 'ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েন্টাল আর্ট, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ', *পশ্চিমবঙ্গ*, অবনীন্দ্র সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা।

নিসার হোসেন, ২০০৭। 'জয়নুল আবেদিন', *চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮*, (সম্পাদকঃ লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নাসিমা হক মিতু, ২০০৭। 'রশিদ চৌধুরী', *চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* (সম্পাদকঃ লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

নজরুল ইসলাম, ২০০২। *জয়নুল আবেদিন, তাঁর কাজ ও কথা*, সমাবেশ, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ১৯৯০। *জয়নুল আবেদিনের জিজ্ঞাসা*, মুক্তধারা, ঢাকা।

বদরুদ্দীন উমর, ২০০৭। 'ভাষা আন্দোলন', *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, প্রথম খণ্ডঃ রাজনৈতিক ইতিহাস* (সম্পাদকঃ সিরাজুল ইসলাম, সহযোগী সম্পাদকঃ সাজাহান মিয়া), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, ২০০৫। *ইতিহাস নির্মাণের ধারা*, বাংলাদেশ চর্চা, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুর রহিম, আবদুল মমিন চৌধুরী, এ. বি. এম মাহমুদ, সিরাজুল ইসলাম, ২০১৩। *বাংলাদেশের ইতিহাস*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

মুর্তজা বশীর, ২০১৪। *আমার জীবন ও অন্যান্য*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৪। 'পূর্ব ও পশ্চিম', *রবীন্দ্রনাথের প্রগতিভাবনা নির্বাচিত প্রবন্ধ* (সংকলন ও সম্পাদনা: অলোক রায়), ন্যাশনাল বুক স্ট্রাট, ইন্ডিয়া।

শাওন আকন্দ, ২০০৯। 'একটি প্রাথমিক অনুসন্ধান, ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামঃ বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা,' *শিল্পরূপ*, তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ঢাকা।

শোভন সোম, ১৪০২। 'জয়নুল আবেদিন', *নিরন্তর*, চতুর্থ সংখ্যা, বর্ষা সংকলন, শ্রাবণ, ঢাকা।

১৯৯৮। *শিল্প শিক্ষা ও ঔপনিবেশিক ভারত*, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, নিউ দিল্লি।

শ্যামাচরণ শ্রীমানী, ১৯৮৬। 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরী', *বাংলার শিল্প সমালোচনার ধারা* (সম্পাদনাঃ শোভন সোম, অনিল, আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০০৭। 'কাইয়ুম চৌধুরী', *চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮* (সম্পাদকঃ লালা রুখ সেলিম), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

সালাহ্উদ্দীন আহমদ, ২০০০। *উনিশ শতকে বাংলার সমাজ চিন্তা ও সমাজ বিবর্তন ১৮১৮-১৮৩৫*, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ২০০৭। *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সৈয়দ আজিজুল হক, ২০১৫। *জয়নুল আবেদিন, সৃষ্টিশীল জীবনসমগ্র*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

স্বপন বসু, ২০১১। *উনিশ শতকে বাংলায় নবচেতনা*, সুবর্ণ, ঢাকা।

স্বাতী ঘোষ, আশোক সরকার, ২০১৫। *কবির পাঠশালা পাঠভবন ও শিক্ষাসত্রের ইতিহাস*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

হারুন-আর-রশিদ, ২০০৩। *বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হাসান উজ্জামান, ১৯৯২। *বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম*, পল্লব পাবলিশার্স, ঢাকা।

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin, 2007. *Post-Colonial Studies, The key Concepts*, Routledge, London and NewYork.

Geeta Kapur, 1982. 'Modern Indian Painting; A Synoptic View', *Journal of Arts and Ideas,* Oct-Dec.

2001. *When was Modernism*, Tulika Books, India.

Jalal Uddin Ahmed, 1962. *Art in Pakistan,* Pakistan Publication, Karachi.

John Sular, 2013. *Photographic Psychology: image and Psyche*, Truecenter Publishing.com/Photopsy/article-index.htm.

Lawrence E. Cahoone, 1996. *From Modernism to Postmodernism: An Anthology*, Blackwell, UK, USA.

Neelima Vashistha, 2010. *Tradition and Modernity in Indian Arts, During the Twentieth Century*, Indian Institute of Advanced Study, Shimla, Aryan Books International, New Delhi.

Partha Mitter, 1992. *Much Maligned Monsters, A History of European Reactions to Indian Art,* The University of Chicago Press, Chicago and London.

Peter Burger, 1992. 'On the Problem of the autonomy of Art in Bourgeois Society', *Art in Modern Culture, an Anthology of Critical Texts* (edited by Francis Franscina and Jonathan Harris) Phaidorn Press Limited, London.

Partha Mitter, 2007. *The Triumph of Modernism, India's Artists and the Avant Garde 1922-1947*, Reakton Books, London.

Tapati Guha-Thakurta, 1992. *The Making OF a New 'Indian' Art, Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c.1850-1920.* Cambridge University Press, Great Britain.

1995. "Visualizing the Nation, the Iconography of a 'National' Art in Modern India", *Journal Of Art and Ideas,* Numbers 27-28.

Raymond William, 1988. *Keywards, a Vocabulary of Culture and Society.* Fontana Press. London.

Shri Jogesh chandra Bagal. 1966. 'History of the Govt. College of Art and Craft'. *Centenary government College of Art Craft.* Calcutta.